সম্ভাবনা তত্ত্ব, কোয়ান্টাম টানেলিং ও নক্ষত্রের দহন

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

আজ আলোচনা শুরু করব গুরুগম্ভীরভাবে। প্রথমেই সম্ভাবনা তত্ত্বের দুয়েকটা কথা। তারপর কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাথে এর সম্পর্কের কথা। তারপর বলব সূর্যসহ সব নক্ষত্র কীভাবে টিকে আছে কোয়ান্টাম মেকানিকসের কল্যাণে।

মজার ব্যাপার হলো, আমরা সবসময় বলি, মহাবিশ্ব চলে চার প্রকার বল দিয়ে। এর মধ্যে তিনটি বল চলে কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র মেনে। কাজ করে প্রামাণবিক জগতে। এরা হলো সবল ও দুর্বল নিউক্লিয় বল ও তড়িচ্চুম্বকীয় বল। আর অপর বল মহাকর্ষ মেনে চলে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতা। যে বল কাজ করে গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ বা তারচেয়ে বড় আকারে বস্তুতে। মজার ব্যাপারটা হলো, নক্ষত্র, ছায়াপথদের অনেক কাজ কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিকসের সূত্র ছাড়া অচল। নক্ষত্রদের আলো দেখে এদের শক্তির বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখি। সেই বহিঃপ্রকাশ সম্ভব হত না, যদি না থাকত কোয়ান্টাম মেকানিকস।

সম্ভাবনা তত্ত্বের একেবারে প্রাথমিক নমুনা পাওয়া যায় আরব গণিতবিদ আল খলিলির বুক অব ক্রিপ্টোগ্রাফিক মেসেজ বইয়ে। তিনি স্বরবর্ণ ছাড়া ও সহ সব আরবি শব্দের বিন্যাস সমাবেশ করতে চেয়েছিলেন। আল কিন্দি সূচনা করেছিলেন পরিসংখ্যানিক অনুমান, ক্রিপ্টোবিশ্লেষণ ও গণসংখ্যা বিশ্লেষণের। তবে আধুনিক সম্ভাবনা তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটে ক্যাসিনোতে। জুয়াড়িদের হাত ধরে। জুয়া খেলায় হার-জিতের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকতে সম্ভাবনার চর্চার শুরু।

সম্ভাবনা তত্ত্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ষোড়শ শতকের ইতালীয় গণিতবিদ (আসলে বহুবিদ) গেরোলামো কারদানো ও সপ্তদশ শতকের পিয়েরে ফার্মা ও ব্লেইজ প্যাসকেল। তত্ত্বটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এক মাইলফলক বেইজের উপপাদ্য। একটি ঘটনা ঘটে গেলে তার ওপর নির্ভরশীল অন্য ঘটনার সম্ভাবনা বের করা যায় এ উপপাদ্য দিয়ে। থমাস বেইজ প্রথম যখন এটি প্রকাশ করেন, গুরুত্বটা কেউ বোঝেনি। কিন্তু আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্ত্বা, মেশিন লার্নিং, মেডিক্যাল রিসার্চসহ বিজ্ঞানের বড় বড় অনেক শাখা টিকে আছে এরই কল্যাণে।

সম্ভাবনাকে বলা হয় অনিশ্চয়তা পরিমাপ করার উপায়। যখন নিশ্চিত করে বলা যায় না একটি ঘটনা ঘটবে কি ঘটবে না, তখনই চলে আসে সম্ভাবনা। সম্ভাবনানির্ভর ঘটনাকে বলে দৈব (random) ঘটনা। অনিশ্চয়তাকে পরিমাপ করার উপায় আছে কয়েকটি। ধরুন, একটি ঝুড়িতে ৩ টি কালো ও ২টি লাল বল আছে। তাহলে না দেখে একটি বল তুললে সেটি লাল হবার সম্ভাবনা ২/৫ বা ৪০% । কালো হবার সম্ভাবনা ৩/৫ বা ৬০%। একইভাবে একটি বিশুদ্ধ ছক্কার গুটি নিক্ষেপ করলে ১ উঠার সম্ভাবনা ১/৬। সম্ভাবনা পরিমাপ করার এ উপায়টিকে বলে সনাতন পদ্ধতি।

আরেকটি উপায় হলো প্রায়োগিক বা গণসংখ্যা পদ্ধতি। একে আসলে বলা যায় আরেকটু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। ধরুন, আমরা জানতে চাই, একটি মুদ্রায় ভেজাল আছে কি না। মানে টস করলে হেড ও টেইল পড়ার সম্ভাবনা সমান কি না। বা নিছক জানতে চাই, কোনটা উঠার সম্ভাবনা কত। এটা জানতে হলে কয়েনটিকে অনেকবার টস করতে হবে। পরিসংখ্যানের একটি নিয়ম হলো, যত বেশি নমুনা নেওয়া হবে, সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে তত ভাল করে জানা যাবে। ধরুন, আমরা ১০০০ বার টস করে ৪৯০টি হেড ও ৫১০টি টেইল পেলাম। তাহলে আমরা বলতে পারি, এই কয়েনে হেড পড়ার সম্ভাবনা ০.৪৯ ও টেইল পড়ার সম্ভাবনা ০.৫১। বুঝতেই পারছেন, ৪৯০ ও ৫১০কে ১০০০ দিয়ে ভাগ দিয়ে পাওয়া যাবে এই সম্ভাবনা।

বিজ্ঞান ক্রমশ আগের চেয়ে ভাল ফল পেতে চায়। আগের চেয়ে বড় নমুনা নিয়ে কাজ করে। এভাবেই বিজ্ঞান এগিয়ে যায়। বিজ্ঞানের সাথে সম্ভাবনার এই ধারণাটির মিল এখানেই। ধরুন, আমরা কয়েনের হেড ও টেলের আরও নিখুঁত সম্ভাবনা জানতে চাই। তাহলে বাড়াতে হবে টসের সংখ্যা। ধরুন, ১০,০০০ বার টস হলো। এবারে হয়ত ৪৯২০ ও ৫০৮০ বার যথাক্রমে হেড ও টেইল পড়ল। তাহলে হেড ও টেলের নতুন সম্ভাবনা হবে যথাক্রমে ০.৪৯২ ও ০.৫০৮।

দুটি দলের মধ্যে খেলা কে জিতবে সেটা বের করার একটি সরল উপায়ও এটি। যেমন এ পর্যন্ত এল ক্লাসিকো ম্যাচ (বার্সেলোনা ও রিয়াল মাদ্রিদের ম্যাচ) খেলা হয়েছে ২৭৭টি। দুটি দিলই জিতেছে ৯৬টি করে ম্যাচ। ড্র হয়েছে ৮৫টি ম্যাচ। তাহলে পরের ম্যাচে রিয়াল জিতবে তার সম্ভাবনা ৯৬/২৭৭ বা ০.৩৫ বা ৩৫ %। সমান সম্ভাবনা বার্সেলোনার। আর ড্র হবার সম্ভাবনা ৩০%। পরের ম্যাচের ফল হাতে আসার সাথে সাথেই কিন্তু এই সম্ভাবনাগুলো পাল্টে যাবে। মনে রাখতে হবে, এখানে যেটা বললাম, এটা কিন্তু সম্ভাবনা বের করার খুব সরল একটি উপায়।

সম্ভাবনার ব্যাখ্যাও নানান রকম হতে পারে। ধরুন, একটি রাস্তায় ট্রাক দূর্ঘটনার সম্ভাবনা ০.০১%। এর একটি ব্যাখ্যা হলো, এখানে প্রতি ১০০টি ট্রাক চলাচল করলে গড়ে একটি দূর্ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশ দলের টেস্ট ম্যাচ জেতার সম্ভাবনা ১০% হলে গড়ে প্রতি ১০ ম্যাচে একটি ম্যাচে জয় আসবে।

উচ্চতর পরিসংখ্যানে সম্ভাবনাকে বের করা হয় গাণিতিক ফাংশন দিয়ে। ফাংশন থেকে পাওয়া মানকে গ্রাফে বসিয়েও সহজে দেখা যায়। বিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে উলম্ব দাগ আর অবিচ্ছিন্ন চলকের ক্ষেত্রে কার্ভের ক্ষেত্রফল সম্ভাবনা প্রকাশ করে। কার্ভকে অনেক সময় তরঙ্গ বা তরঙ্গের অংশবিশেষ হিসেবে চিন্তা করা যায়।

চিত্র ১ ও ২: বিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছন্ন চলকের সম্ভাবনা বিন্যাস

~~পাশাপাশি বসাতে হবে~~

হুট করেই এই সম্ভাবনা ঢুকে পড়ে কোয়ান্টাম মেকানিকসের জগতে। নিউটনীয় বলবিদ্যা অনুসারে বস্তুর আদিবেগ ও বেগ বৃদ্ধির হার জানলে আমরা বলতে পারব নির্দিষ্ট সময় পরে বস্তুটি কোথায় থাকবে। কিন্তু কোয়ান্টাম বলবিদ্যায় নিশ্চিত করে বলা যায় না বস্তুকণাটি কত সময় পরে কোথায় চলে গেল। বস্তুর অবস্থান নির্ধারণ করে স্রডিঙ্গারের তরঙ্গ সমীকরণ। একগুচ্ছ আলাদা আলাদা জায়গায় থাকার সম্ভাবনা পাওয়া যায় *বর্ন রুল* থেকে। এই রুল বা নিয়ম বলছে, প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গায় থাকার সম্ভাবনা পাওয়া যায় তরঙ্গ ফাংশন থেকে পাওয়া বিস্তারকে বর্গ করে।

কোয়ান্টাম মেকানিকসের আবির্ভাবের আগেই কণার সম্ভাবনাধর্মীতা টের পাওয়া গিয়েছিল ১৮০১ সালে থমাস ইয়ংয়ের দ্বি-চির পরীক্ষার মাধ্যমে।

একটা সরু দেয়ালের কথা কল্পনা করুন, যাতে দুটি সমান্তরাল ও সরু ছিদ্র আছে। এই ছিদ্রদের ভেতর দিয়ে কণা নিক্ষেপ করলে কী হবে তা দেখার আগে চলুন দেখি আলো ফেললে কী হয়। দেয়ালের এক পাশে একটি নির্দিষ্ট রংয়ের এর আলো ফেলুন। আলোর রং নির্দিষ্ট হওয়ায় এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও নির্দিষ্ট। এখন বেশির ভাগ আলোই দেয়ালে বাধা পাবে। কিন্তু কিছু আলো ছিদ্র ভেদ করে ওপারে চলে যাবে। ধরুন যে দেয়ালের ওপারে, আলো থেকে উল্টো দিকে একটি পর্দা রেখে দিলেন। এই পর্দার যে কোনো বিন্দুতে দুই ছিদ্রের আলোই পৌঁছাবে। কিন্তু সে বিন্দুগুলোতে আলো পৌঁছানোর ক্ষেত্রে দুটি আলাদা ছিদ্র দিয়ে যাওয়া আলোকে ভিন্ন পরিমাণ দূরত্ব পাড়ি দিতে হবে। অতিক্রান্ত দূরত্ব ভিন্ন হওয়াতে দুই ছিদ্র দিয়ে যাওয়া তরঙ্গ দুইটি পর্দায় পৌঁছেও ভিন্ন দশায় থাকবে। কিছু জায়গায় এক তরঙ্গের খাঁজ অপর তরঙ্গের চূড়ার সাথে মিলে যাবে। এক্ষেত্রে দুটি তরঙ্গ একে অপরকে বিলীন করে করে দেবে। অন্য জায়গায় দুটি তরঙ্গের চূড়া ও খাঁজরা সমান তালে চলবে (একটির চূড়া অপরটির চূড়া বরাবর থাকবে)। এ কারণে তরঙ্গের শক্তি বেড়ে যাবে। তবে বেশিরভাগ জায়গায়ই এই দুই অবস্থার মাঝামাঝি ঘটনা ঘটবে। এর ফল, আলো- আঁধারির কিছু বৈশিষ্ট্যময় নকশা চোখে পড়বে।

চিত্র ৩

দ্বি-চির পরীক্ষায় উপরের ও নিচের ছিদ্র দিয়ে পর্দার বিভিন্ন উচ্চতায় পৌঁছা তরঙ্গের দূরত্ব ভিন্ন হওয়ায় কোথাও তরঙ্গ একে অপরেকে শক্তিশালী করে, আবার কোথাও একে অপরকে নাকচ করে দেয়। এই ব্যতিচারের ফলে তৈরি হয় একটি নকশা।

মজার ব্যাপার হল, আপনি যদি আলোক উৎসের বদলে কণা নিঃসারকও (যেখান থেকে নির্দিষ্ট গতিসম্পন্ন কণা যেমন ইলেকট্রন নির্গত হবে) ব্যবহার করেন, তবুও একই ধরনের নকশা পাওয়া যাবে। (কোয়ান্টাম থিওরি অনুসারে ইলেকট্রনকে যদি নির্দিষ্ট বেগ দেওয়া হয় তবে এর জড় তরঙ্গের নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য থাকবে।) মনে করুন, আপনি একটি চির বন্ধ রেখে দেয়ালের দিকে ইলেকট্রন ছুঁড়ে দিলেন। বেশির ভাগ ইলেকট্রনকে দেয়াল থামিয়ে দেবে। কিন্তু কিছু ইলেকট্রন চির ভেদ করে ওপাশের পর্দায় পৌঁছবে। মনে হতে পারে যে দেয়ালে দ্বিতীয় আরেকটি চির খুলে দিলে পর্দার প্রতিটি বিন্দুতে আঘাত হানা ইলেকট্রনের সংখ্যা আরও বেশি হবে। কিন্তু আরেকটি চির খুলে দিলে দেখা যায়, কিছু বিন্দুতে ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি, আবার কোনোটায় ইলেকট্রনের সংখ্যা খুব কম। মনে হচ্ছে যেন ইলেকট্রনের মধ্যেও আলোর মতোই ব্যতিচার হচ্ছে, যা তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য। কণার নয়।

**এবার কল্পনা করুন, চির দুটি দিয়ে একটি করে ইলেকট্রন প্রবাহিত করা হল। এবারেও কি ব্যতিচার ঘটবে**? **মনে হতে পারে, প্রতিটি ইলেকট্রন দুটি চিরের যে কোনো একটি দিয়ে পার হবে। ফলে ব্যতিচার ঘটার কথা নয়। কিন্তু বাস্তবে একটি করে ইলেকট্রন পাঠানো হলেও ব্যতিচারের নকশা দেখা যায়। তার মানে প্রতিটি ইলেকট্রন একই সাথে দুটো চির দিয়েই যাচ্ছে! ব্যতিচার ঘটাচ্ছে নিজের সাথেই।**

**দ্বি-চির পরীক্ষার মাধ্যমেই কণার অবস্থানের সাথে সম্ভাবনার যোগসূত্র পাওয়া যায়। ম্যাক্স বর্ন পরবর্তীতে সেটাকে তরঙ্গের বিস্তারের সাথে সম্পর্কে দেখিয়ে সূত্র প্রদান করেন। ৩ নং চিত্রে আলোর ব্যতিচারে সাদার পরিমাণ যত বেশি, সেখানে কণাটি থাকার সম্ভাবনা তত বেশি। (ব্যতিচারের নকশাকে উপরের সম্ভাবনা বিন্যাসের কার্ভের সাথে মিলিয়ে দেখুন)।**

**এবার দেখা যাক কোয়ান্টাম মেকানিকসের সাথে সূর্যের আলোর কী সম্পর্ক। সূর্যসহ নক্ষত্রদের কেন্দ্রে হাইড্রোজেনরা যুক্ত হয়ে আরও বড় পরমাণু হিলিয়াম তৈরি করে। এই প্রক্রিয়া চলার সময় কিছু ভর আলো ও তাপ আকারে অবমুক্ত হয়। এই আলো ও তাপ সূর্য থেকে বেরিয়ে আসতেই প্রয়োজন পড়ে কোয়ান্টাম মেকানিকসের অবিশ্বাস্য এক কৌশল।**

**ধরুন, একটি পাহাড়ের পাদদেশে একটি বল আছে। ধরি, বলটির গতিশক্তি ১০০ জুল। পাহাড়ের বিভব শক্তি ১০ জুল হলে বলটি সহজেই পাহাড়টি পার হয়ে যাবে। চিরায়ত গতিবিদ্যা অনুসারে গড়িয়ে দিলে বলটি পাহাড় পার হবে তার সম্ভাবনা ১০০%। কিন্তু পাহাড়ের উচ্চতা আরও বেশি হলে বিভব শক্তি বাড়বে। ধরুন ২০০ জুল হলো। এবার আর বলটি পাহাড় পার হতে পারবে না। সম্ভাবনা শূন্য। কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিকসে বলের একটি তরঙ্গ ফাংশন আছে। ফলে তরঙ্গ আকারে বলটি পাহাড়ের অপর পাশে চলে যাওয়ার একটি অশূন্য সম্ভাবনা আছে। এই ঘটনারই নাম কোয়ান্টাম টানেলিং। গাণিতিক সমীকরণ দিয়ে বিষয়টা আরও বেশি সহজে বোঝা যায়। তরঙ্গের সাথে সম্ভাবনা তত্ত্বকে মিলিয়ে চিন্তা করলেই এটা বোঝা যায়।**

**চিত্র ৪ ও ৫**

**অন্য একটি বাস্তব উদাহরণ চিন্তা করি। প্রোটন খুব স্থিতিশীল একটি কণা। এর গড় আয়ুর নিম্নসীমাই ১০^৩৩ বছর। তার মানে, এক বছরে একটি প্রোটন কণা ক্ষয় হবে তার সম্ভাবনা ১০**^(-৩৩)**। অনেক অনেক ছোট একটি সংখ্যা। অল্প কয়েকটি প্রোটন কণা বিবেচনা করলে কোনো প্রোটনকে ক্ষয় হতে দেখা যাবে না। তবে যথেষ্ট বেশি পরিমাণ প্রোটন নিয়ে পরীক্ষা চালালে বছরে কয়েকটি প্রোটন কণাকে ভাঙতে দেখা অসম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, উপরে উল্লিখিত সময়টি প্রোটনের গড় আয়ু। সব প্রোটনের আয়ু সমান নয়। সংক্ষিপ্ত কথা হলো**, **সম্ভাবনা অল্প হলেও বেশি জিনিস নিয়ে কাজ করলে অল্প সম্ভাবনার ঘটনাও ঘটতে পারে।**

সূর্যের কেন্দ্রে প্রতি সেকেন্ডে ৪ × ১০^৩৮ টি প্রোটন (হাইড্রোজেন) কণা মিলিত হয়ে হিলিয়াম তৈরি করে। প্রতিটি প্রোটন সেকেন্ডে প্রায় ৫০০ কিমি. বেগে ছোটাছুটি করে। সূর্যের কেন্দ্রে ঘনত্ব কিন্তু অনেক বেশি। সোনার ঘনত্বের প্রায় ১০ গুণ। ফলে প্রোটন-প্রোটন সংঘর্ষ ঘটে হরহামেশা। প্রতি সেকেন্ডেই বিলিয়ন বিলিয়ন সংঘর্ষ ঘটে। ফিউশন বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রোটনরা যুক্ত হয়ে হিলিয়াম তৈরি করে আলো ও তাপ তৈরির জন্য অল্প কিছু প্রোটনরা মিলিত হলেই যথেষ্ট। সূর্যে প্রায় ১০^৫৭ টি প্রোটন আছে। এর মধ্যে প্রতি ১০^২৮টির একটি অন্য একটির সাথে মিললেই হয়।

কিন্তু প্রোটনের বেগের বিপরীত আছে আরেকটি নিয়ামক। প্রোটন একটি (ধনাত্মক) চার্জধারী কণা। ফলে কণাগুলো একে অন্যকে করে বিকর্ষণ। তাহলে হিসেব করে দেখতে হবে, এই বিকর্ষণ এড়িয়ে প্রোটনরা নিজেদের সাথে যুক্ত হতে পারে কি না। হিসেব বলে, এতটা গতিশক্তি প্রোটনের নেই। কিন্তু ফিউশন তো হচ্ছে। কিন্তু কীভাবে?

আরও গভীর স্তরের এই কণাগুলো নিছক কণা হিসেবে আচরণ করে না। প্রতিটি প্রোটন এক একটি কোয়ান্টাম কণা। প্রতিটির আছে তরঙ্গ ফাংশন। বৈদ্যুতিক চার্জ তাদেরকে দূরে রাখলেও এরা তরঙ্গমালা প্রবাহিত করে একে অপরের কাছে চলে আসবে তার একটি অশূন্য সম্ভাবনা আছে। আর যেহেতু সূর্যে আছে বহু বহু (আগে উল্লিখিত) কণা, তাই তাদের মধ্যে অনেকেই (১০^২৮ টিতে একটি) একে অপরের কাছে চলে আসে।

চিত্র ৬

কোয়ান্টাম টানেলিং না থাকলে তাই নক্ষত্ররা আলো দিতে পারত না। মহাবিশ্বের বেশিরভাগ অংশ হত অন্ধকার, শীতল। আর সেজন্যেই গ্রহ-নক্ষত্ররা শুধু সার্বিক আপেক্ষিকতা দিয়ে চলছে বিষয়টি ঠিক না নয়। বড়-ক্ষুদ্র সব জগতের কাজেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে কোয়ান্টাম তত্ত্ব।

সূত্র

১। প্রিপোস্টারাসিউনিভার্স ডট কম, কোয়ান্টা ম্যাগাজিন

* http://www.preposterousuniverse.com/blog/2014/07/24/why-probability-in-quantum-mechanics-is-given-by-the-wave-function-squared/
* <https://www.quantamagazine.org/where-quantum-probability-comes-from-20190909/>
* <https://www.forbes.com/sites/ethansiegel/2015/06/22/its-the-power-of-quantum-mechanics-that-allow-the-sun-to-shine/>
* <https://www.theguardian.com/science/life-and-physics/2014/oct/19/understanding-quantum-tunnelling>
* <https://phys.libretexts.org/Bookshelves/University_Physics/Book%3A_University_Physics_(OpenStax)/Map%3A_University_Physics_III_-_Optics_and_Modern_Physics_(OpenStax)/07%3A_Quantum_Mechanics/7.07%3A_Quantum_Tunneling_of_Particles_through_Potential_Barriers>
* http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Particles/protondec.html